Louis Pasteur

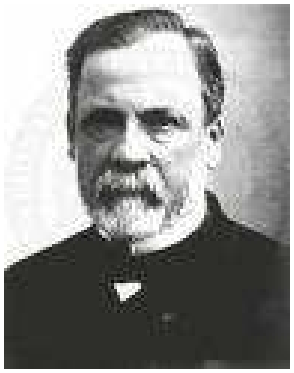

লুই পাস্তুর

[১৮২২–১৮৯৫]

প্যারিসের এক চার্চে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে। কন্যাপক্ষের সকলে কনেকে নিয়ে আগেই উপস্থিত হয়েছে। পাত্রপক্ষের অনেকেই উপস্থিত। শুধু বর এখনো এসে পৌঁছাননি। সকলেই অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে কখন বর আসবে। কিন্তু বরের দেখা নেই।

চার্চের পাদ্রীও অধৈর্য হয়ে ওঠে। কনের বাবা পাত্রের এক বন্ধুকে ডেকে বললেন, কি ব্যাপার, এখনো তো তোমার বন্ধু এল না? পথে কোন বিপদ হল না তো?

বন্ধু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। দু-চার জায়গায় খোঁজ করল কিন্তু কোথাও বরের দেখা নেই। হঠাৎ মনে হল একবার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে খোঁজ করলে হত। যা কাজপাগল মানুষ, বিয়ের কথা হয়ত একেবারেই ভুলে গিয়েছে।

ল্যাবরিটরিতে গিয়ে হাজির হল বন্ধু। যা অনুমান করেছিল তাই সত্যি। টেবিলের সামনে মাথা নিচু করে আপন মনে কাজ করে চলেছে বর। চারপাশের কোন কিছুর প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নেই। এমনকি বন্ধুর পায়ের শব্দেও তাঁর তন্ময়তা ভাঙে না। আর সহ্য করতে পারে না বন্ধু, রাগেতে চেঁচিয়ে ওঠে, আজ তোর বিয়ে, সবাই চার্চে অপেক্ষা করছে আর তুই এখানে কাজ করছিস!

মানুষটা বন্ধুর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, বিয়ের কথা আমার মনে আছে কিন্তু কাজটা শেষ না করে কি করে বিয়ের আসরে যাই!

বিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসর্গীকৃত এই মানুষটির নাম লুই পাস্তুর। ১৮২২ সালের ক্রীসমাস পর্বের দুদিন পর ফ্রান্সের এক ক্ষুদ্র গ্রাম জেলেতে পাস্তুর জন্মগ্রহণ করেন। বাবা যোসেফ পাস্তুর প্রথম জীবনে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করতেন। ওয়ার্টার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর যোসেফ পাস্তুর প্রথম জীবনে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করতেন। ওয়ার্টার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়েনের পরাজয়ের পর যোসেফ পাস্তুর নিজের গ্রামে ফিরে এসে ট্যানারির কাজে যুক্ত হন। অল্প কিছুদিন পরেই স্বগ্রাম পরিত্যাগ করে আরবয় নামে এক গ্রামে এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন। এখানেই ট্যানারির (চমড়া তৈরির কাজ) কারখানা খুললেন।

যোফেস কোনদিনই তাঁর পুত্র লুইকে ট্যানারির ব্যবসায়ে যুক্ত করতে চাননি। তার ইচ্ছা ছিল পুত্র উপযুক্ত শিক্ষালাভ করুক। কয়েক বছর স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করবার পর যোফেস পুত্রকে পাঠালেন প্যারিসের এক স্কুলে।

গ্রামের মুক্ত প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা লুই প্যারিসের পরিবেশ কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। শহরের দমবন্ধ পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠত তাঁর কাছে। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এই সময় একটা চিঠিতে লিখেছেন, "যদি আবার বুক ভরে চামড়া গন্ধ নিতে পারতাম, কয়েকদিনেই আমি সুস্থ হয়ে উঠতাম।"

অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ধীরে ধীরে শহরের নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন লুই। তাঁর গভীর মেধা অধ্যাবসায় পরিশ্রম শিক্ষকদের দৃষ্টি এড়াল না। ছাত্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, লুই পাস্তুর একজন কৃতি শিক্ষক হবে, তার সে ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে হয়নি।

এরপর তিনি ভর্তি হলেন রয়েল কলেজে। সেখান থেকে ১৮ বছর বয়েসে স্নাতক হলেন। এই সময় নিজের কলেজেই তিনি একদিকে শিক্ষকতার কাজ শুরু করলেন, অন্যদিকে বিজ্ঞানে ডিগ্রী নেবার জন্য পড়াশুনা করতে থাকেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়েসে তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পাস্তুরের প্রিয় বিষয় ছিল রসায়ন। রসায়নের উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে আরম্ভ করলেন। দু'বছর পর মাত্র বছরে লুই পাস্তুর স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য ডাক পেলেন। আনন্দের সঙ্গে এই পদ গ্রহণ করলেন পাস্তুর।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন মর্সিয়ে লরেন্ট। তাঁর গৃহে নিয়মিত যাতায়াত করতে করতে রেক্টরের ছোট মেয়ে মেরির প্রেমে পড়ে যান। কয়েক সপ্তাহ পরেই রেক্টরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন পাস্তুর। মঁসিয়ে লরেন্টও অনুভব করেছিলেন পাস্তুরের প্রতিভা। তাই এই বিয়েতে তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন।

কিন্তু বিজ্ঞান তপস্বী লুই পাস্তুর বিয়ের দিনেই বিয়ের কথা প্রায় ভুলতে বসেছিলেন। এই মিলন পাস্তুরের জীবনকে সুখ-শান্তিতে ভরিয়ে দিয়েছিল। স্ত্রী মেরি ছিলেন পাস্তুরের যোগ্য সহচরী। স্বামীর সর্বকাজে আজীবন তিনি সাহায্য করে গিয়েছেন।

একবার ফ্রান্সের যুবরাজ স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে এলেন, সেই উপলক্ষে বিরাট আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকরাই তাদের পরিবারের লোকজন নিয়ে সেই আনন্দ উৎসবে যোগদান করল। শুধু পাস্তুর তাঁর গবেষণাগারে আপন কাজে এত আত্মমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন, ভুলেই গিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের কথা।

সন্ধ্যেবেলায় যখন নিজের গৃহে ফিরে এলেন পাস্তুর সমস্ত দিনের আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি বলে একটিবারের জন্য অনুযোগ করলেন না মেরি। স্বামীর সাধনায় নিজেকেও উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। তাই পরবর্তীকালে পাস্তুরের এক ছাত্র বলেছিল, তিনি শুধু পাস্তুরের স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন তাঁর যোগ্য সহচরী।

১৮৫৪ সালে মাত্র বত্রিশ বছর বয়েসে পাস্তুরকে লিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ডিন এবং প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হল।

লিলের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য মদ তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছিল। এই মদ থেকে সরকারের সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হত। কিছুদিন যাবৎ সকলেই লক্ষ্য করছিল কারখানায় প্রস্তুত মদের একটা বিরাট অংশ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে গাঁজ হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এতে শুধু কারখানা মালিক নয়, সকরারেও ক্ষতি হচ্ছিল। এর কারণ অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হল পাস্তুরের উপর।

একদিন তিনি একটা মদের কারখানায় গেলেন। সেখানে বড় বড় চৌবাচ্চায় মদ ঢালা হত। একদিন থাকত ভাল মদ অন্যদিকে খারাপ মদ। দুই মদের নমুনা এনে পরীক্ষা করলেন পাস্তুর। দীর্ঘ পরীক্ষার পর লক্ষ্য করলেন, ভাল মদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র গোল এক ধরনের পদার্থ রয়েছে (globules of Yeast nearly spherical) এবং খারাপ মদের মধ্যে লম্বা ধরনের ক্ষুদ্র পদার্থ রয়েছে (elongated)। পাস্তুর সিদ্ধান্তে এলেন কোন পারিপার্শ্বিক প্রভাবে গোলাকৃতি পদার্থটি লম্বা আকার ধারণ করছে আর তারই ফলে ভাল মদে গাঁজ সৃষ্টি হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুরু হল তাঁর গবেষণা। দীর্ঘ দশ বছর সাধনার পর তিনি সিদ্ধান্তে এলেন বাতাসের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য জীবাণুর দল যারা ভাল মদের সংস্পর্শে এসে তার মধ্যে গাঁজন সৃষ্টি করছে। এতদিন ধারণা ছিল এই সমস্ত জীবাণুর জন্ম আপনা থেকে কিম্বা কোন অজৈব পদার্থ থেকে হয়। এই প্রচলিত ধারণা ভেঙে তিনি জন্ম দিলেন এক নতুন ধারণার।

পাস্তুর শুধু মদ বিনষ্টের কারণ যে বারিরিয়া বা জীবাণু (Bactria) তার স্বরূপ উৎঘাটন করেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কি ভাবে মদের গুণগত মানের পরিবর্তন না করে তার ক্ষতিকর ব্যাক্টিরিয়াকে ধ্বংস করা যায়। তিনি মদকে বিভিন্ন উত্তাপে গরম করতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে লক্ষ্য করেন ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বা ১৩১ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপে মদের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ক্ষতিকর ব্যাক্টিরিয়া ধ্বংস-হয়।

তাঁর এই আবিষ্কৃত তথ্য আজ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে পাস্তুরাইজেসন (Pasteuri-zation) নামে পরিচিত। বর্তমানে এই পদ্ধতিতে শুধু যে মদ সংরক্ষণ করা হয় তাই নয় এতে নানান ধরনের খাবার পানীয় দুধ ক্রীম সংরক্ষণ করা হয়। যার সুফল আমরা সকলেই ভোগ করছি। কিন্তু অতি সামান্য সংখ্যক মানুষই জানে এ সমস্তই পাস্তুরের অবদান।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কারকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে লাগলেন লর্ড লিস্টার (Lord Lister)। আগে যে কোন ক্ষতই সহজে দূষিত হয়ে যেত। তিনি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যাতে বাতাসে ভেসে থাকা জীবাণুরা ক্ষতস্থানে প্রবেশ করতে না পারে।

এই সময় ফরাসী দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প ছিল রেশম শিল্প। কিন্তু এক অজানা রোগে হাজার হাজার গুটি পোকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান করেও সেই রোগের কারণ, তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিরূপণ করতে পারছিলেন না। অবশেষে ফরাসী সরকার এই কাজের দায়িত্ব দিলেন পাস্তুরের উপর। দীর্ঘ তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি আবিষ্কার করলেন গুটি পোকার দুটি প্রধান অসুখ এবং সেই অসুখ নির্মূল করবার উপায়।

এই গবেষণার কাজে অমানুষিক পরিশ্রমের জন্য গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই সময় প্রতিদিন আঠারো ঘণ্টা কাজ করতেন। তাঁর সর্বশরীর প্রায় অবশ হয়ে পড়েছিল। ডাক্তাররা তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করেছিল। কিন্তু প্রবল মানসিক শক্তির সাহায্যে বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি চিন্তা করতেন উন্নত গুটি পোকা সৃষ্টির উপায় যাতে আরো বেশি রেশম উৎপাদন করা যায়।

তিনি বললেন অসুস্থ গুটি পোকাকে বাদ দিতে। কারণ কার ডিম থেকে যে গুটি পোকার জন্ম হয় সেই গুটি পোকাও হয় দুর্বল অসুস্থ।

চাষীরা পাস্তুরের কথামত গুটি পোকা বাছাই করতে আরম্ভ করল। এর ফলে গুটি পোকার কারবারীরা এতদিন যারা ইচ্ছামত খারাপ গুটি পোকা বিক্রি করত তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল। পাস্তরের বিরুদ্ধে তারা নানান মিথ্যা প্রচার করতে আরম্ভ করল। চাষীরাও সেই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে উঠল।

পাস্তুর তখন সবেমাত্র সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সব কিছু শুনে তিনি শুধু বললেন, ধৈর্য্য ধর।

অবশেষে তাঁর ধৈর্যের ফল পাওয়া গেল। সেই বছর অভূতপূর্ব রেশম উৎপাদন হল।

পাস্তুর তখন সবেমাত্র সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সব কিছু শুনে বললেন, ধৈর্য্য ধর।

অবশেষে তাঁর ধৈর্যের ফল পাওয়া গেল। সেই বছর অভূতপূর্ব রেশম উৎপাদন হল।

পাস্তুর এই কাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গীকৃত করলেও বিনিময়ে সামান্যই পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্যে অন্তরে সামান্যতম ক্ষোভ ছিল না পাস্তুরের। বিপদের দিনে দেশকে সাহায্য করতে পেরেছিলেন, এতেই তাঁর আনন্দ আর তৃপ্তি।

একবার তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের দরবারে গিয়েছেন। তাঁর পারিশ্রমিকের কথা শুনে সম্রাট বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি এত কম অর্থ নিয়ে এত বেশি পরিশ্রম করেন কেন?

জবাবে পাস্তুর বললেন, একজন বিজ্ঞানী কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কাজ করে না।

মানব কল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন সেই সুদিনের–যখন সকলে ভোগ করবে সুস্থ দেহ তখন পূর্ণ হবে মনের আশা, গড়ে উঠবে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্বন্ধ।

দেশের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালবাসা। যখন জার্মান বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করল, তিনি ফ্রান্সের সৈন্যদলে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য সে ইচ্ছা পূর্ণ হল না। কিন্তু জার্মান বাহিনীর এই আগ্রাসনকে কিছুতেই অন্তরে মেনে নিতে পারলেন না পাস্তুর। জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানিক ডক্টর অফ মেডিসিন উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এক চিঠিতে লিখলেন, আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে উপাধি দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ করতে আমি অক্ষম, কারণ আপনাদের সম্রাট শুধুমাত্র পৈশাচিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দুটি মহান যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এই যুদ্ধ মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল পাস্তুরকে। তাঁর একমাত্র পুত্র ছিল ফরাসী বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ অফিসার। পাস্তুর সংবাদ পেলেন যুদ্ধে তাঁর পুত্রের বাহিনী পরাজিত হয়েছে। তাদের অধিকাংশই হয় নিহত, না হয় আহত। সামান্য সংখ্যক সৈন্যই নিরাপদে পালাতে সক্ষম হয়েছে। অসুস্থ দেহেই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন পাস্তুর। চারিদিকে সৈন্যদের মৃতদেহ। আহত সৈন্যদের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সেবা করবার মত কেউ নেই। পাগলের মত সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে বেড়াতে থাকেন পাস্তুর, কোথায় তাঁর পুত্র? কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেলেন না। ক্রমশই আশা হারিয়ে ফেলেন। হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়েছেন; সময় একজনের কাছে সংবাদ পেলেন কিছুদূরে পথের ধারে এক আহত সৈন্যকে দেখেছেন। তাড়াতাড়ি সেই পথে ছুটে গেলেন পাস্তুর। একটা ভাঙা গাড়ির উপর শুয়েছিল একজন। পাস্তুর তার কাছে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি সার্জেন্ট পাস্তুরকে দেখেছেন?

মুহূর্তে মানুষটি মুখ তুলে তাকাল তারপরই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, বাবা!

আহত পুত্রকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন পাস্তুর। কয়েক মাসের মধ্যে পুত্র সুস্থ হয়ে আবার সৈন্যদলে যোগ দিল।

পাস্তুরও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ১৮৬৭ সালে তাঁকে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হল। এখানে এসে শুরু করলেন জীবাণু তত্ত্ব (Bacteriology) সম্বন্ধে গবেষণা। দু বছর ধরে চলল তাঁর গবেষণা। এই সময় ফ্রান্সের মুরগীদের মধ্যে ব্যাপক কলেরার প্রভাব দেখা দিল। পোলট্রি ব্যবসায়ের উপর বিরাট আঘাত নেমে এল। পাস্তুরের উপর রোগের কারণ অনুসন্ধানের ভার পড়ল। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাস্তুর আবিষ্কার করলেন এক জীবাণুর। এবং এই জীবাণুই ভয়াবহ এনথ্রক্স (Anthrox) রোগের কারণ এই এনথ্রক্স রোগ মাঝে মাঝে মহামারীর আকার ধারণ করত। গবাদি পশু-পাখি, শূয়র, ভেড়ার মৃত্যুর হার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেত। পাস্তুর এনথ্রক্স রোগের সঠিক কারণ শুধু নির্ণয় করলেন না, তার প্রতিষেধক ঔষধও আবিষ্কার করলেন। রক্ষা পেল ফ্রান্সের পোলট্রি শিল্পী। বলা হত জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্সের যা ক্ষতি হয়েছিল, পাস্তুরের এক আবিষ্কার তার চেয়েও বেশি অর্থ এনে দিয়েছিল। পাস্তুরের এই আবিষ্কার, তাঁর খ্যাতি, সম্মান কিছু মানুষের কাছে ঈর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তারা নানাভাবে তাঁর কুৎসা রটনা করত। কিন্তু নিন্দা প্রশংসা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমান উদাসীন। একবার কোন সভায় পাস্তুর চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। গুরিয়েন নামে এক ডাক্তার কিছুতেই মানতে পারছিলেন না একজন রসায়নবিদ চিকিৎকদের কাছে চিকিৎসা বিদ্যার উপদেশ দেবেন। নানাভাবে তাঁকে বিব্রত করতে লাগলেন। কিন্তু সামান্যতম ক্রুদ্ধ হলেন না পাস্তুর। রাগে ফেটে পড়লেনস গুরিয়েন। সভা থেকে তাকে বার করে দেওয়া হল।

পরদিন গুরিয়েন ডুয়েল লড়বার জন্য পাস্তুরকে আহ্বান করলেন। কিন্তু গুরিয়েনের সেই আহ্বান ফিরিয়ে দিলেন পাস্তুর, বললেন, আমার কাজ জীবন দান করা, হত্যা করা নয়।

এতদিন শুধু কীটপতঙ্গ আর জীবজন্তুর জীবনদানের ওষুধ বার করেছেন। তখনো তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটুকু বাকি ছিল। হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক ছিল সে যুগের এক মারাত্মক ব্যাধি। এনথ্রক্স-এর চেয়েও তা মারাত্মক। যখন কোন মানুষকে পাগলা কুকুরে কামড়াত, সেই ক্ষতস্থান সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত হয়ে উঠত না। অধিকাংশ সময়েই সেই ক্ষত কয়েকদিনেই শুকিয়ে যেত। কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রকাশ পেত সেই রোগের লক্ষণ। রুগী অবসন্ন হয়ে পড়ত। তেষ্টা পেত কিন্তু জলস্পর্শ করতে পারত না। এমনকি প্রবাহিত জলের শব্দ শুনেও অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ত। দু-তিন দিন পরই মৃত্যু হত রুগীর।

কয়েক বছর যাবৎ হাইড্রোফোবিয়া নিয়ে কাজ করছিলেন পাস্তুর। নিজের গবেষণাগারের সংলগ্ন এলাকায় পাগলা কুকুরদের পুষেছিলেন। যদিও কাজটা ছিল অত্যন্ত বিপদজনক তবুও সাহসের সাথে সেই কুকুরদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। একদিন এক বিশালদেহি বুলডগ কুকুর পাগলা হয়ে উন্মাত্তের মত চিৎকার করছিল। তার মুখ দিয়ে ঝরে পড়ছিল বিষাক্ত লালা। তাকে বন্দী করে খাঁচায় পোরা হল। সেই খাঁচার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল একটা খরগোশকে। কিন্তু আশ্চর্য হলেন পাস্তুর। পাগলা কুকুরটি একটি বারের লালা খরগোশের দেহে প্রবেশ করানো একান্ত প্রয়োজন ছিল।

গবেষণার প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিলেন পাস্তুর। বহু কষ্টে দড়ি বেঁধে ফেললেন সেইহিংস্র কুকুর। তারপর একটা টেবিলের উপর শুইয়ে মুখটা নিচু করলেন। তারপর মুখে রসামনে একটা কাচের পাত্র ধরলেন, টপ টপ করে তার মধ্যে পড়িয়ে পড়তে লাগল বিষাক্ত লালা। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন পাস্তুর ঐ বিষাক্ত লালা দিয়েই তৈরি হয় জলাতঙ্কের সিরাম।

এবার পরীক্ষা শুরু হল। প্রথমে তা প্রয়োগ করা হয় খরগোশের উপর, তারপর অন্যান্য জীব-জন্তুর উপর। প্রতিবারই আশ্চর্য ফল পেলেন পাস্তুর। জীব-জন্তুর দেহে তা কার্যকর হলেও মানুষের দেহ কিভাবে তা প্রয়োগ করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না পাস্তুর। কতটা পরিমাণ ঔষুধ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে তার কোন সঠিক ধারণা নেই। সামান্য পরিমাণের তারতম্যের জন্য রোগীর প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য জেনেও সমস্ত দায় এসে বর্তাবে তাঁর উপর। কিভাবে এই জটিল সমস্যার সমাধান করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না পাস্তুর।

অবশেষে অপত্যাশিতভাবেই একটা সুযোগ এসে গেল। জোসেফ মিস্টার বলে একটি ছোট ছেলেকে কুকুরে কামড়েছিল। ছেলেটির মা তাকে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার তাকে পাস্তুরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

পাস্তুর জোসেফকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন তার মধ্যে রোগের বীজ সংক্রামিত হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য। পাস্তুর স্থির করলেন জোসেফের উপরেই তাঁর আবিষ্কৃত সিরাম প্রয়োগ করবেন।

নয় দিন ধরে বিভিন্ন মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করতে লাগলেন পাস্তুর। একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে জোসেফ। তবুও মনের উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ দূর হয় না। অবশেষে তিন সপ্তাহ পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল জোসেফ। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল পাস্তুরের আবিষ্কারের কথা। এক ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করলেন পাস্তুর।

বৃষ্টিধারার মত চতুর্দিক থেকে তাঁর উপরে সম্মান বর্ষিত হতে থাকে। ফরাসী একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হলেন তিনি।

১৮৯২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর পাস্তুরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা প্যারিসে জমায়েত হলেন। Antiseptic Surgery-র আবিষ্কর্তা জোসেফ লিস্টার বললেন, পাস্তুরের গবেষণা অস্ত্র চিকিৎসার অন্ধকার জগতে প্রথম আলো দিয়েছে। শুধুমাত্র অস্ত্র চিকিৎসা নয়, ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মানব সমাজ চিরদিন তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

দেশ-বিদেশের কত সম্মান, উপাধি, পুরস্কার, মানপত্র পেলেন। কিন্তু কোন কিছুতেই বিজ্ঞান সাধক পাস্তুরের জীবন সাধনার সামান্যতম পরিবর্তন ঘটেনি। আগের মতই নির অহঙ্কার সরল সাদাসিদা রয়ে গেলেন।

একবার আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে পাস্তুর ফরাসী দেশের প্রতিনিধি হিসাবে লন্ডনে, গিয়েছেন। তিনি যখন হলে প্রবেশ করলেন, চতুর্দিক থেকে শত শত মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিতে থাকে। পাস্তুর বিব্রতভাবে এক সঙ্গীকে বললেন, এই সংবর্ধনা নিশ্চই যুবরাজ ওয়েলসের জন্য, আমার আরো আগে আসা উচিত ছিল।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সম্মেলনের সভাপতি। তিনি এগিয়ে এসে পাস্তুরকে বললেন, এই সংবর্ধনা যুবরাজের জন্য নয়, এ আপনারই জন্য।

প্যারিসে ফিরে এলেন পাস্তুর, তাঁর সম্মানে গড়ে উঠেছিল পাস্তুর ইন্সটিটিউট–এখানে সংক্রামক রোগের গবেষণার কাজ চলছিল।

পাস্তুর অনুভব করতে পারছিলেন তাঁর দেহ আর আগের মত কর্মক্ষম নেই। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। সকলের অনুরোধে কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন। এই সময় বাইবেল পাঠ আর উপাসনার মধ্যেই দিনের বেশির ভাগ সময় কাটতেন। তবুও অতীত জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। মাঝে মাঝেই তাঁর ছাত্ররা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত। তিনি বলতেন তোমরা কাজ কর, কখনোই কাজ বন্ধ করো না।

তাঁর সত্তরতম জন্মদিনে ফ্রান্সে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হল। সোরবোনে তাঁর সম্মানে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন।

সকলের অভিনন্দনের উত্তরে পাস্তুর বললেন, "আপনাদের ভালবাসায় আমি অভিভূত। আমি সমস্ত জীবন ধরে বিশ্বাস করেছি একমাত্র বিজ্ঞান আর শান্তির চেতনায় পারে সমস্ত অজ্ঞানতা আর যুদ্ধের বিভীষিকাকে দূর করতে। রাষ্ট্রের সাময়িক দুর্যোগ যেন মনকে আচ্ছন্ন না করে। বিশ্বাস রাখুন একদিন সমস্ত দেশই সম্মিলিত হবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তি সহযোগিতার পক্ষে আর সেই ভবিষ্যৎ হবে বর্বরদের নয়, শান্তিপ্রিয় মানবজাতির।"

এরপর আরো তিন বছর বেঁচে ছিলেন পাস্তুর। অবশেষে ১৮৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন বিজ্ঞান-তপস্বী লুই পাস্তুর। যাঁর সম্বন্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন বলেছিলেন, ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান।